১। দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল লেখ-র গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর :— ৫

[Discuss the Aihole inscription of Pulakesin II]

আদি মধ্যযুগে যে সব লেখগুলি রাজপরিবার বা রাজকর্মচারীর আদেশে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল, তার মধ্যে বহু লেখ প্রশস্তি পর্যায়ভুক্ত। এই প্রশস্তিমূলক লেখগুলির মধ্যে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর রচিত করা আইহোল লেখ - আদি মধ্যযুগের ইতিহাস, বিশেষত তৎকালীন রাজনৈতিক ইতিহাস = উদ্ঘাটন করায় ঐতিহাসিকদের বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠেছে। বর্তমান কর্ণাটক প্রদেশের অন্তর্গত আইহোলে অবস্থিত মেগুতি মন্দিরের পূর্বদিকের গায়ে সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ করা এই লেখটি ভারতীয় ইতিহাসে আইহোল প্রশস্তি নামে খ্যাত। আনুমানিক ৬৩৪ থেকে ৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এই লেখটি উৎকীর্ণ করেছিলেন চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর সভাকবি রবিকীর্তি। দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিপত্তি অর্জনের কথা উল্লেখের সাথে সাথে এই লেখ থেকে বাতাপির চালুক্য রাজবংশের উত্থান ও এই বংশের একেবারে শুরুর সময়ের থেকে দ্বিতীয় পুলকেশীর পিতৃব্য মঙ্গলেশ-এর রাজত্বকালে প্রায় ১ শতাব্দী ব্যাপী কালপর্বটি

তাই ইতিহাসে পাওয়া যায়।

আইহোল লেখ অনুসারে চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জয়সিংহবল্লভ এবং তাঁর পর তার পুত্র রণরাগ রাজা হন, রণরাগের পুত্র প্রথম পুলকেশী বাদামীতে নিজের রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাঞ্চলে এই রাজবংশের স্বতন্ত্র শাসন কায়েম করে, এছাড়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করে তিনি তার শক্তি বৃদ্ধি করেন, তার পুত্র প্রথম কীর্তিবর্মন সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হওয়ার পর নল, মৌর্য এবং কদম্বদের মতো শক্তিগুলিকে দমন করেন, প্রথম কীর্তিবর্মনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মঙ্গলেশ রেবতী দ্বীপ অধিকার করে ও কলচুরি রাজ বুদ্ধরাজকে পরাস্ত করে চালুক্য রাজ্যকে উত্তরে আরও বিস্তৃত করে, মঙ্গলেশ তার উত্তরাধিকারী রূপে তার নিজপুত্রকে মনোনীত করলে তার ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশীর সাথে যুদ্ধ বাধে। চালুক্যরাজ্যের এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে শেষপর্যন্ত দ্বিতীয় পুলকেশী মঙ্গলেশকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করে দক্ষিণে কদম্বদের উত্তরে লাট, মালব ও গুর্জরদের মতো শক্তিদের পরাস্ত করেন, অতঃপর তিনি পরাক্রমশালী রাজা

হর্ষবর্ধনকে নর্মদা নদীর নিকটবর্তী অঞ্চলের যুদ্ধে পরাস্ত করে হর্ষের অবিজ্ঞাতবাহিত আধিপত্য লাভ করে, পূর্বদিকে দ্বিতীয় পুলকেশী দিগ্বিজয়ে অগ্রসর হয়ে কোশল ও কলিঙ্গকে পদানত করেন এবং পিষ্টপুর ও কুনাল অঞ্চল অধিকার করেন, তিনি কাঞ্চির পল্লবদেরও পরাস্ত করেন. এরপর কাবেরী নদী অতিক্রম করে চোল, পান্ড্য ও কেরলের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে এবং পরিশেষে পল্লবদের আরও একবার পরাস্ত করে রাজধানী বাতাপীতে ফিরে যান।

আইহোল লেখ থেকে পুলকেশীর দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ইতিহাস জানা যায়, তাই নয়, রবিকীর্তি ~~লেখে~~ এই লেখতে নিজেকে কালিদাস ও ভারবি-এর সমকক্ষ মনে করেছেন, যা এই লেখ-র সাহিত্যিক উৎকর্ষতাকেও তুলে ধরে, তবে দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে, এই লেখ থেকে পাওয়া পশ্চিম চালুক্যদের রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত গ্রহণযোগ্য হলেও তা যেন সাহিত্য গ্রন্থের তুলনায় তথ্য পরিমাণে রচিত হওয়ায় তথ্য কিছুটা সংক্ষিপ্ত, এছাড়া লেখটি উৎকীর্ণ করার সাল এতে ~~উল্লিখিত~~ উল্লিখিত না থাকলেও হর্ষসমাসের ঘটনা বর্ণনা করার সময় কোন সালের

কথা বলা হয়নি, তাই সমকালীন অন্যান্য তথ্যসূত্রের আলোকে আর্যদের লেখা থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলি তুলনামূলক আলোচনার মধ্যে দিয়ে আরও সঠিক ঐতিহাসিক সত্য অনুসন্ধান করা যায়।

৫। হর্ষচরিত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।
(Write a short note on Harshacharit)(5)

উঃ আদি মধ্য যুগের ভারত ইতিহাস রচনার প্রধান উপাদান হল সাহিত্য। ইতিহাসের উপাদানে সমৃদ্ধ অনেক গুলি সাহিত্য এই যুগে রচিত হয়। এই সকল সাহিত্য কর্মের সুনিশ্চিত মূল্যমানের অনেক প্রশ্ন থাকলেও এগুলি কোনো না কোনো ভাবে ইতিহাস রচনায় সাহায্য করেছে। এই সকল তথ্য সমৃদ্ধ সাহিত্যিক উপাদানের মধ্যে অন্যতম হল 'হর্ষচরিত' গ্রন্থটি। হর্ষবর্ধন এর সমকালীন ইতিহাস রচনায় যা নানা ভাবে সাহায্য করে।

হর্ষবর্ধনের সভাকবি বানভট্ট রচিত হর্ষচরিত গ্রন্থটি ৮-টি অংশে বিভক্ত, এর অধিকাংশ গদ্য ছন্দে রচিত হলেও কিছু অংশে কৃত্রিম কাব্য সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়গুলিতে বানভট্ট নিজের জীবনী ও পারিবারিক ইতিহাসের বর্ণনা দিয়েছেন। দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ অধ্যায়গুলিতে হর্ষবর্ধনের পূর্বপুরুষদের কথা ও থানেশ্বর রাজ্যের ইতিহাস ও অবশিষ্ট অংশে মুখ্যত উঠেছে হর্ষবর্ধনের রাজ্যলাভ, সামরিক অভিযান ও শক্তির বিস্তার এবং বিন্ধ্য অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের ইতিহাস। বানভট্টের হর্ষচরিত, রাজ্যশ্রীর উদ্ধার এবং হর্ষবর্ধন কর্তৃক শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হওয়া পর্যন্ত এসে আকস্মিক ভাবে শেষ হয়েছে। শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষের অভিযান কতদূর সফল হয়েছিল সে সম্পর্কে বানভট্ট নীরবই রয়ে গেছেন।

হর্ষচরিতের মধ্য দিয়ে সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক যেসব তথ্য পাওয়া যায় তা হর্ষবর্ধনের আমলের ইতিহাস রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করে। তাছাড়া হর্ষচরিতে কেবল হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল সম্পর্কে হিউ-এন-সাং এর বিবরণ সমর্থিত হয়েছে তাই নয়, নতুন বহু তথ্য হর্ষচরিত থেকে পাওয়া গেছে যা হিউ-এন-সাং আদৌ উল্লেখ করেননি। এতদ সত্ত্বেও

Scanned by CamScanner

ইতিহাসের উপাদান হিসেবে হর্ষচরিতের গুরুত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মহলে মতভেদ রয়েছেই আছে। এ.এল. ব্যাসামের মতে, হর্ষের জীবনের অনেক কথা বাণ আত্মপ্রসাদ সহকারেই বলেছেন ঠিকই, তবু অত্যুক্তি যে কতকাংশে করেছেন তা বোঝা যাচ্ছে। আর বাণ লিখেছেন অনেক কথা এমন ভাবে যা ঐতিহাসিকদের বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, হর্ষচরিতে ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন ঘটনার বিবরণ আছে সর্বাধিক ১২ পৃষ্ঠার মতো। অবশিষ্ট আলোচনায় সম্রাটের গুণকীর্তন ও লেখকের কল্পনা প্রাধান্য পেয়েছে। তাই একে প্রকৃত ইতিহাসের উপাদান হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া যুক্তিহীন। অবশ্য বাণভট্ট এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু হিসেবে বহমান ঘটনাকে সত্যই গ্রহণ করেছেন, তবে তাইতে অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন এর সাহিত্যগত মান বৃদ্ধির দিকে। তাই হর্ষচরিত সত্যই ঐতিহাসিক গ্রন্থ তার তুলনায় অনেকগুণ বেশী কল্পনাধর্মী সাহিত্যে পর্যবসিত হয়েছে।

Scanned by CamScanner

○ আদি-মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদানসমূহ ঃ

◎ সাহিত্য ঃ বিজ্ঞানসম্মতভাবে ইতিহাস চিন্তা ও ইতিহাস লেখার সূত্রপাত ভারতে ঘটে ব্রিটিশ আমলে। উনিশ শতকে ভারতীয় ইতিহাসবিদ্‌রা বৌদ্ধিক অনুসন্ধিৎসা এবং যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ দ্বারা ইতিহাস চর্চার নতুন ধারার সূচনা করেন। এর ফলশ্রুতিতে ভারতে ইতিহাসবিদ্যা ও ইতিহাস চর্চার আবির্ভাব ঘটে। তবে আধুনিক যুগে ভারতে ইতিহাসবিদ্যার আবির্ভাব ঘটলেও প্রাচীনকালে এদেশে ইতিহাসবোধ ও ইতিহাসচর্চা একেবারেই ছিল না কিংবা সেকালে ইতিহাস গ্রন্থ আদৌ রচিত হয়নি, এমন ধারণা সঠিক নয়। Hero-lands গীতগাথায় ভ্রূণাকারে ইতিহাসমূলক বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (খীষ্টপূর্ব ৩য় শতক/ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক) ইতিহাসের বিষয়বস্তুর ব্যাপক পরিধির উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িক, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদিকে ইতিহাসের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইতিহাস 'পঞ্চম বেদ' হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় প্রাচীন ভারতে ইতিহাসের উপর একটা পবিত্রতার ছাপ দেওয়ার ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। *ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার* মনে করেন, কৌটিল্য কথিত ইতিহাস ধর্মের এক্তিয়ার বহির্ভূত মানবজীবনের নানা দিককে স্পর্শ করতে দায়বদ্ধ ছিল। ব্যক্তি ও ঘটনা বিষয়ক ঐতিহ্য, আর্থ-রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক তত্ত্ব এবং সেই সব তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ, আইন বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিধিবিধান সবই ইতিহাসের উপজীব্য ছিল।

বর্তমানে ইতিহাস বলতে বোঝায় বিভিন্ন যুগের আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনাসহ কালানুক্রমিক ভিত্তিতে রাজা বা রাজবংশের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সেই সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতির বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক কাঠামো ইতিহাসের অন্যতম প্রধান উপজীব্য হিসেবে স্বীকৃত। প্রাচীন ভারতেও এই বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে সমকালীন লেখকদের সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে পুরাণ গ্রন্থে বর্ণিত 'সূত' ও 'মাধব'দের কর্তব্য কর্মের উল্লেখ করা যায়। *পার্জিটার*-এর মতে, পুরাণে বর্ণিত রাজনৈতিক ইতিহাসের অংশের উপাদান 'সূতগণ' কর্তৃক সংগৃহিত। রাজাদের বংশতালিকা, ঐতিহ্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে বীরগাথা 'সূত'রাই সংগ্রহ করতেন। পুরাণ প্রদত্ত তথ্যর ভিত্তিতেই পার্জিটার, প্রাক্-গুপ্ত ভারতের অন্তত কুড়িটি বংশের তুলনামূলক তালিকা প্রস্তুত করেছেন। গুপ্ত রাজাদের আমলে এই ব্যবস্থা কিছুটা নতুন রূপে পালিত হয়। এ সময় সরকারী মহাফেজখানায় বংশতালিকা রাখার প্রথা চালু হয়। সমকালীন তাম্র লেখ থেকে এ ধরনের তালিকা সংরক্ষণ ব্যবস্থার কথা জানা যায়। নিঃসন্দেহে পুরাণ গ্রন্থের শিক্ষা থেকেই এই ব্যবস্থার সৃষ্টি।

Scanned by CamScanner

প্রাচীন ভারতে ইতিহাসের উপজীব্য বিষয়াবলী সম্পর্কে লেখার রীতি চালু থাকলেও আক্ষরিক অর্থে 'ইতিহাসমূলক' গ্রন্থের অভাব সম্পর্কে সংশয় নেই। আবেগাপ্লুত হয়ে এই ঐতিহাসিক তথ্যটিকে অস্বীকার করা যায় না। তবে এই কারণে ঐতিহাসিক সত্য অনুসন্ধানের কাজ হয়ত কিছুটা জটিল হয়েছে, কিন্তু অসম্ভব হয়ে পড়েনি। আদি-মধ্যযুগের ভারতবর্ষ সম্পর্কেও এই কথাটি প্রাসঙ্গিক। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন থেকে তুর্কী-আফগান শাসনের সূচনা কাল (৬৫০—১২০০ খ্রীঃ) পর্যন্ত আদি-মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসমূলক তথ্য বা উপাদান হিসেবে আমরা মূলত সাহিত্য কীর্তির উপর নির্ভর করি। সমকালীন লেখ ও মুদ্রার সাক্ষ্য দ্বারা সাহিত্য থেকে সংগৃহীত তথ্যাবলীকে পরিশুদ্ধ করে নেবার চেষ্টা করা হয়। তবে সমকালীন ঘটনার বিবরণ বিষয়ক নির্ভরযোগ্য নিরপেক্ষ সাহিত্যের অপ্রতুলতা যেমন স্পষ্ট ; তেমনি লেখ বা মুদ্রার পরিমাণও সীমিত।

আদি-মধ্যযুগের ইতিহাসের প্রধান উপাদান হল সাহিত্য। ইতিহাসের উপাদানে সমৃদ্ধ অনেকগুলি সাহিত্য এ যুগে রচিত হয়। এই সকল সাহিত্য কর্মের গুণগত মূল্যমানে অনেক প্রভেদ আছে। তবে এগুলি সকলেই কোন-না-কোন ভাবে ইতিহাস রচনার কাজে সহায়তা করেছে। সমকালীন তথ্য সমৃদ্ধ অন্যতম গ্রন্থ হল বাণভট্ট রচিত *'হর্ষচরিত'।* গ্রন্থটি মূলত গদ্যে রচিত। অবশিষ্ট অংশ পদ্যে রচিত। বাণভট্ট তাঁর এই গ্রন্থে হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালের প্রথম কয়েক মাসের ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে হর্ষবর্ধনের পৃষ্ঠপোষকতা ধন্য বাণভট্ট তাঁর লেখনীতে ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষতা দেখাতে পারেননি। তিনি অযৌক্তিকভাবে হর্ষবর্ধনকে একজন পরাক্রমশালী ও প্রজাদরদী শাসক হিসেবে চিত্রিত করেছেন। ড. *রমেশচন্দ্র মজুমদারের* মতে, হর্ষচরিত গ্রন্থে ঐতিহাসিক গুরুত্ব সমৃদ্ধ বিবরণী বারো পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ বিলহন দাক্ষিণাত্যের চালুক্য বংশীয় রাজা ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের সভাকবি ছিলেন। ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের কর্মকাহিনী স্মরণীয় করার উদ্দেশ্যে তিনি *'বিক্রমাঙ্কদেব চরিত'* গ্রন্থ রচনা করেন। বিক্রমাদিত্যের পূর্বসূরী প্রথম ও দ্বিতীয় সোমেশ্বরের রাজত্বকালের কিছু তথ্যও এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। একাদশ শতকের আট-এর দশকে রচিত এই গ্রন্থ দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তথ্যের সূত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। অনুরূপ আর একটি ইতিহাসমূলক গ্রন্থ হল সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত *'রামচরিত'*। বাংলার পালবংশীয় শাসক রামপাল-এর কীর্তিকাহিনী এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। সমকালের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা কৈবর্ত বিদ্রোহের বিবরণ এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়। বাণভট্টের মতই সন্ধ্যাকর তাঁর রচনায় রাজা রামপালের প্রতি অকারণ পক্ষপাত দেখিয়েছেন। তবে এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হল এটি দ্ব্যর্থবোধক। এটি এক অর্থে রাজা রামপালের গৌরবগাথা ; আবার অন্য অর্থে অযোধ্যাপতি রাজা রামচন্দ্রের বিবরণ। ফলে ইতিহাসের উপাদানের তুলনায় শ্লোক কাব্য হিসেবেই এটি বেশি সার্থক। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে বাক্‌পতিরাজ প্রাকৃত ভাষায় রচনা করেন *'গৌড়বহ'* (গৌড় বধ) কাব্য। এই গ্রন্থে কনৌজ রাজা যশোবর্মনের বঙ্গ বিজয় সম্পর্কে এক কল্পনা মিশ্রিত আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। চালুক্য বংশ সম্পর্কিত আর একটি গ্রন্থ হল *'কুমারপালচরিত'*। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে বিখ্যাত জৈন কবি আচার্য জয়সিংহ এটি রচনা করেন। পালি ভাষায় রচিত এই গ্রন্থে চালুক্য বংশীয় নৃপতি কুমারপালের কাহিনী বর্ণিত রয়েছে। ১০০৫ খ্রীষ্টাব্দে পদ্মগুপ্ত রচনা করেন আর একটি রাজপ্রশস্তিমূলক গ্রন্থ *'নবশশাঙ্কচরিত'*। এটি

Scanned by CamScanner

গৌড়রাজ শশাঙ্কের বিবরণ নয়। এই গ্রন্থের কেন্দ্রে আছেন গুর্জরবংশীয় জনৈক সিন্ধু রাজা। ইনি নবশশাঙ্ক নামেই অভিহিত হতেন।

স্মরণীয় যে, এই জীবনচরিতগুলির ইতিহাসগত মূল্য খুবই সীমিত। এদের রচনাশৈলীও যথেষ্ট উন্নত ও ভারসাম্যপূর্ণ নয়। ভাষাও সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার উর্ধ্বে। ভাসা, অলংকরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে যেমন কৃত্রিমতার প্রাধান্য দেখা যায়; তেমনি বিষয়বস্তু বর্ণনার ক্ষেত্রে বাস্তবের পরিবর্তে পৃষ্ঠপোষক-রাজন্যবর্গের মনোরঞ্জনের দিকেই লেখকদের ঝোঁক ছিল বেশি। স্বভাবতঃই, ইতিহাসের উপাদান হিসেবে এদের সাক্ষ্য গ্রহণ করার বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যিক।

আদি-মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে স্থানীয় ইতিবৃত্তগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে সব থেকে উল্লেখযোগ্য রচনাটি হল কাশ্মিরী ঐতিহাসিক কলহন-এর *'রাজতরঙ্গিনী'*। গ্রন্থটির রচনাকাল আনুমানিক ১১৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দ। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যগুলির মধ্যে একমাত্র রাজতরঙ্গিনীকেই ইতিহাস-গ্রন্থের মর্যাদা দেওয়া হয়। *এ. এল. ব্যাসামের* মতে, *"প্রচলিত সংস্কৃত সাহিত্যাবলীর মধ্যে কেবল এই গ্রন্থ (রাজতরঙ্গিনী)-টিই প্রকৃত ইতিহাস রচনার প্রয়াস হিসেবে সুন্দর"* *(The book is unique as the only attempt at the true history in the whole of surviving Sanskrit literature)*। কাব্যছন্দে রচিত এই গ্রন্থে কলহন ঐতিহাসিকের নির্মোহ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পূর্বাপর ঘটনার বিশ্লেষণ করেছেন। রাজতরঙ্গিনী রচনার অন্যতম লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন গ্রন্থে বিধৃত কাশ্মীরের খণ্ডিত ইতিহাসকে একটি সুসংবদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া। এজন্য তিনি রাজাদের সমকালীন লেখকদের রচনাবলী থেকে প্রাথমিক উপাদান সংগ্রহ করেছেন। কাশ্মীরের স্থানীয় পুরাণ গ্রন্থ *'নীলামত পুরাণ'* থেকেও তিনি রসদ সংগ্রহ করেন। তবে বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া তিনি কোন তথ্য গ্রহণ করেননি। বিভিন্ন পত্রলেখ এবং ধর্মস্থানকে উৎসর্গী-সংক্রান্ত দলিল পত্রের সাক্ষ্য দ্বারা সাহিত্যসূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে যাচাই করেছেন। তাঁর কৃতিত্ব এই যে, তিনি কাশ্মীরের রাজাদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। তবে তথ্যের অভাবের কারণে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের পূর্ববর্তী ইতিহাস সমানভাবে নির্ভরযোগ্য হয়নি। স্থানীয় ইতিবৃত্ত হিসেবে গুজরাট সম্পর্কিত রচনাগুলিও উপাদান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। সোমেশ্বর রচিত *'রসমালা'* ও *'কীর্তিকৌমুদি'*, বালচন্দ্র লিখিত *'বসন্ত বিলাস'* গুজরাট সম্পর্কিত বহু তথ্য সরবরাহ করে। ইতিহাসের সমগোত্রীয় ছিল কিছু প্রবন্ধ সংকলন। ১৩০৬ খ্রীষ্টাব্দে জৈন মেরুতুঙ্গ রচিত *'প্রবন্ধ চিন্তামনি'* এমনই একটি উল্লেখযোগ্য রচনা।

গুপ্তদের আমল থেকে সরকারী মহাফেজখানায় বংশতালিকা রাখার ব্যবস্থা হলেও, সূত্রগণ তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে বংশতালিকা রচনার কাজ চালিয়ে যেতেন। নেপালী বংশাবলী, বাংলার কুলজী গ্রন্থ, আসামের বুরঞ্জী প্রভৃতি একই ধরনের ঘটনাপঞ্জী হিসেবে ইতিহাসের সূত্র নির্দেশ করে। সিন্ধুদেশের অনুরূপ ঘটনাপঞ্জী থেকে সংগৃহীত তথ্য নিয়েই *'চাচনামা'* রচিত হয়েছে। এমনকি কলহনও কাশ্মীর বিষয়ক ঘটনাপঞ্জী থেকে উপাদান সংগ্রহ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে রাজবংশের উত্থান-পতন, পরিবর্তন, সংঘাত ইত্যাদি কারণে সরকারী মহাফেজখানায় রক্ষিত বংশতালিকা প্রায়ই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিত। কিন্তু সূত্রগণের ঘটনাপঞ্জী

Scanned by CamScanner

সংরক্ষণের প্রয়াস অব্যাহত থাকত। হর্ষচরিত, রাজতরঙ্গিনী প্রভৃতি ইতিহাসমূলক গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে লেখকরাই এইসব ঘটনাপঞ্জীর সাক্ষ্য উল্লেখ করেছেন।

আদি-মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে বিদেশী পর্যটক ও পণ্ডিতদের রচনাগুলি গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে চৈনিক ও আরবীয় পর্যটকদের অবদান সর্বাধিক। চৈনিক পরিব্রাজকদের মধ্যে হিউয়েন সাঙ্-এর নাম সর্বাগ্রগণ্য। ৬৩০ থেকে ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভারতে অবস্থান করেন এবং বুদ্ধদেবের স্মৃতি-বিজড়িত স্থানগুলি পরিভ্রমণ করেন। থানেশ্বরের শাসক হর্ষবর্ধনের আতিথেয়তা লাভ করে তিনি বৌদ্ধদর্শন ও সমকালীন ভারতের জীবন ধারা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ভারত পর্যটনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি লেখেন *'সি-ইউ-কি'* (Siyuki) গ্রন্থটি। তাঁর জীবনীকার হুই-লি'র রচনা থেকে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু জানা যায়। সি-ইউ-কি বা 'পশ্চিমীদেশের স্মৃতি' গ্রন্থে তিনি ভারতের সম্যক, অর্থনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা, রাজনীতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। হিউয়েন সাঙ্-এর রচনাটিও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। তথাপি সমকালীন ভারতের জীবনধারা সম্পর্কে তথ্য আহরণের সূত্র হিসেবে এটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। আর এক চৈনিক পরিব্রাজক *ই-সিং* (I-tsing) সপ্তম শতকের শেষ দিকে (৬৭১-৬৯৫ খ্রীঃ) ভারতে আসেন এবং সমকালের বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচনার ভিত্তিতে সংস্কৃত সাহিত্যের রচনাকাল স্থির করা সম্ভব হয়।

চৈনিক পর্যটকদের বিবরণীর মত ব্যাপকাকার না হলেও, আরবীয় পর্যটকদের সংক্ষিপ্ত বিবরণী আদি-মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাসের উপাদান হিসেবে স্মরণীয়। আরব বণিক সুলেমান নবম শতকে (৮৫১ খ্রীঃ) ভারতে আসেন। পালবংশীয় রাজা দেবপালের সাম্রাজ্য পরিভ্রমণ করে তিনি একটি বিবরণী প্রস্তুত করেন। এই বিবরণী থেকে পাল রাজাদের সুবিশাল সেনাবাহিনী এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্বের জন্য প্রতিহার ও রাষ্ট্রকুটদের সাথে পাল রাজাদের সংঘর্ষের বিষয় জানা যায়। বাগদাদের অধিবাসী আল-মাসুদি ৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন। প্রতিহার রাজ মহীপালের পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীর বিবরণ তাঁর রচনা থেকে জানা যায়। তিনি প্রতিহার রাজ্যকে 'অল-জুজ্‌র' (Al-Juzr) নামে অভিহিত করেছেন। আল-মাসুদির বিবরণ থেকে প্রতিহার রাজ্যের শক্তিশালী সেনাবাহিনী এবং কর্তৃত্ব দখলের জন্য বাংলার পাল রাজা ও দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট রাজাদের অবিরাম সংঘর্ষের কথা জানা যায়। এ ধরনের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল আরব পণ্ডিত আলবেরুণী রচিত *'তহকক্-ই-হিন্দ'* (হিন্দুস্তান অনুসন্ধান)। মধ্য এশিয়ার খারিজম রাজ্যের রাজধানী খিবাতে ৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে আলবেরুণীর জন্ম হয়। তাঁর আদি নাম আবু রায়হান। তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে গজনীর সুলতান মামুদ তাঁকে সভাসদ হিসেবে গজনীতে আনেন। ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু আগে গজনীর সুলতান মামুদের সাথে তিনি ভারতে আসেন। আরবী ও ফার্সীতে দক্ষ এই পণ্ডিত ভারতের দর্শন, গণিতশাস্ত্র, ভেষজবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট হন। 'তহকক্-ই-হিন্দ' গ্রন্থে তিনি তাঁর ভারত সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন। অবশ্য ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি প্রায় নীরব থেকেছেন। তবে ভারতের সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি ভারতীয়দের শিক্ষানুরাগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর ভারতীয় পণ্ডিতদের দক্ষতার কথা এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়। একই সাথে তৎকালীন হিন্দু সমাজের

Scanned by CamScanner

অবক্ষয়ের দিকটিও তিনি তুলে ধরেন। নতুন ভাবধারা গ্রহণ তথা বহির্জগতের পরিবর্তনের সাথে নিজেদের সমন্বয় ঘটানোর কাজে ভারতীয়দের অনীহা ও অক্ষমতার তিনি নিন্দা করেছেন। আলবেরুণীর মতে, এই সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও সংকীর্ণতার ফলেই মুসলমান আক্রমণের সামনে হিন্দুরা ধূলিকণার মত উড়ে গিয়েছিল। (*"—the Hindus became like atoms of dust and scattered in all directions"*)। এমনই আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল আরবী ভাষায় রচিত *'চাচনামা'*। চাচ্ লিখিত এই গ্রন্থ নাসিরুদ্দিন কুবাচার আমলে মহম্মদ-আলি-বিন্-আবুবকর কুফী এটিকে ফার্সীতে অনুবাদ করেন। আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বাপর ঘটনাবলী এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়। মহম্মদ-বিন্-কাশিম কর্তৃক সিন্ধু অভিযানের প্রাক্কালে সিন্ধুদেশের রাজনৈতিক অবস্থা এবং আরব আক্রমণের পরে সিন্ধু অঞ্চলের আর্থ-রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নানা তথ্যে চাচ্নামা সমৃদ্ধ।

○ প্রত্নতত্ত্ব ঃ

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের সূত্র হিসেবে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান যেমন গুরুত্বপূর্ণ ; আদি-মধ্যযুগের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও সে কথা প্রযোজ্য। কারণ সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকীয় ভারত ইতিহাসের উপাদান হিসেবে সাহিত্য সূত্র সর্বাংশে নির্ভরযোগ্য হতে পারেনি। আবার সরকারী স্তরে দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণের প্রথাও তখন গড়ে উঠেনি। স্বভাবতঃই প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষ্য ইতিহাস রচনার কাজে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য উপাদান হিসেবে কাজ করে। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল সমকালের অসংখ্য লেখ। সরকারী ও বেসরকারী উভয় ধরনের লেখই সমকালের ইতিহাসের সূত্র হিসেবে ভূমিকা পালন করে। লেখগুলির মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ লেখগুলি হল প্রতিহার-রাজ মিহিরভোজের *'গোয়ালিয়র প্রশস্তি'*, ধর্মপালের *'খালিমপুর লেখ'*, নারায়ণ পালের *'ভাগলপুর লেখ'*, দেবপালের আমল সম্পর্কিত *'মুঙ্গের লেখ'* ও *'বাদল-প্রশস্তি'*, উমাপতি ধর রচিত বিজয় সেনের 'দেওপাড়া লেখ' ইত্যাদি। লেখর উপর ভিত্তি করেই চোলদের আমলে প্রচলিত গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসনব্যবস্থার স্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলা যায়। এ প্রসঙ্গে দশম শতকে রচিত (৯২১ খ্রীঃ) উত্তর-মেরু গ্রামের মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ লিপিটির নাম উল্লেখ্য। অতি সম্প্রতি (মার্চ ১৯৮৭ খ্রীঃ) মালদহ জেলার জগজ্জীবনপুরে আবিষ্কৃত তাম্র শাসনটি ইতিহাসের নতুন সূত্র প্রদান করে ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। এই তাম্র লেখটি আবিষ্কারের পর এমন ধারণার জন্ম হয়েছে যে রাজা দেবপালের পর প্রথম বিগ্রহ পাল সিংহাসনে বসেননি। দেবপালের অব্যবহিত পরেই সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র জনৈক মহেন্দ্রপালদেব। এই তাম্রশাসনে বৌদ্ধদের ভূমিদান সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। এই বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে পাল রাজারা বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিশেষ অনুগত ছিলেন।

সরকারী লেখগুলি অধিকাংশই ভূমিদান সম্পর্কিত। জমি বিক্রি বা জমিদান-সংক্রান্ত নানা বিষয় এতে উল্লেখ করা আছে। এদের প্রথম অংশটি প্রশস্তিমূলক। এই অংশে রাজার নাম, বংশ পরিচয়, রাজ্যের আয়তন ইত্যাদির বিবরণ থাকে। ভূমিদান অংশে দানকৃত জমির পরিমাপ, রাজস্ব, মূল্য ইত্যাদি লিপিবদ্ধ থাকে। সরকারী লেখর তুলনায় বেসরকারী লেখর সংখ্যা অনেক বেশি। গুপ্ত পরবর্তী যুগের বেসরকারী লেখগুলি প্রধানত সংস্কৃত ভাষায় লেখা এবং ব্রাহ্মণ্য

Scanned by CamScanner

ধর্মবিষয়ক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে প্রাক্-গুপ্ত বেসরকারী লেখগুলির মাধ্যম ছিল প্রাকৃত ভাষা এবং তার কেন্দ্রে ছিল বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম। যাই হোক্, বেসরকারী লেখগুলির প্রচারক ছিলেন মূলত উচ্চ সরকারী পদাধিকারী ব্যক্তিগণ। এগুলির বিষয়বস্তু মূখ্যত ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে 'ব্রহ্মদেয় দান' কিংবা মন্দিরের উদ্দেশ্যে 'দেবদান' সম্পর্কিত। তবে উচ্চপদাধিকারীদের বংশ পরিচয়, সামাজিক অবস্থান, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মচেতনা ইত্যাদি বিষয়ে ইতিহাসমূলক তথ্য অর্জনে এগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

আদি-মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে মুদ্রার গুরুত্ব অকিঞ্চিৎকর। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর মুদ্রার গুরুত্ব হ্রাস পায়। সম্ভবত, এ সময় মুদ্রার ব্যবহার হ্রাস পেয়েছিল। পাল, প্রতিহার, রাষ্ট্রকূট রাজারা খুব কম মুদ্রার প্রচলন করেন কিংবা আদৌ করেননি। সপ্তম শতকের পর থেকে একাদশ শতকের মধ্যবর্তীকালে অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত সমতট-হরিকেল অঞ্চলে কিছু মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে পোড়ামাটির জিনিসপত্র, বুদ্ধমূর্তি, মন্দিরের অবশেষ ইত্যাদি কিছু কিছু পাওয়া যায়। যা সমকালের ইতিহাস রচনায় সাহায্য করে। সম্প্রতি আবিষ্কৃত বেড়াচাঁপার চন্দ্রকেতুগড়ের ধ্বংসাবশেষ, অজয় নদীর তীরে গড়ে ওঠা 'পাণ্ডুরাজার ঢিবি' ইত্যাদি আদি-মধ্যযুগের ইতিহাসের সূত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ।

Scanned by CamScanner

○ আদি-মধ্যযুগে সামন্তপ্রথা সম্পর্কিত বিতর্ক ঃ

'অগ্রহার' ভূমিদান ব্যবস্থার ব্যাপকতার সাথে ভারতবর্ষে আদি-মধ্যযুগের সূচনা তথা সামন্ত ব্যবস্থার উদ্ভবের প্রসঙ্গটি গভীরভাবে সম্পর্কিত। ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের আবির্ভাবের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ভূমি-সম্পর্কের বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এক বিশেষ ধরনের আর্থ-রাজনৈতিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে এক বিশেষ ধরনের উৎপাদন, নির্দিষ্টভাবে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে যুক্ত করে সামন্ত প্রথা ও মধ্যযুগের সূচনার বিষয়টি আলোচিত হয়। ভারতবর্ষে আদি-মধ্যযুগের সূচনাকাল নির্ধারণের ক্ষেত্রেও ইউরোপীয় মডেলটি বিচার করা হয়। অগ্রহার দান ব্যবস্থা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ব্রাহ্মণ শ্রেণীকে অতিক্রম করে ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হলে ভারতবর্ষেও সামন্ততান্ত্রিক উপাদানের আবির্ভাব ঘটে। বিশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক দার্শনিক কার্ল মার্কস সামন্ত ব্যবস্থাকে এক বিশেষ ধরনের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। মার্কসবাদী পণ্ডিতদের মতে, সামন্তপ্রথা মূল উপকরণ ভূমি। ভূসম্পদের উপর ভূস্বামীদের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। এখানে উৎপাদনের উপাদান ও উপকরণের উপর ভূস্বামীদের পূর্ণনিয়ন্ত্রণ থাকে। বলা বাহুল্য উৎপন্ন সামগ্রীর উপরেও ভূস্বামীর একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই ভূস্বামীরা নানা স্তরে বিভক্ত। সর্বনিম্ন স্তরে থাকে ভূমিদাসরা (serf)। এই ভূমিদাস শ্রেণী জমির সাথে আবদ্ধ। তবে জমির উপর এদের কোন মালিকানা থাকে না। জমি হস্তান্তরিত বা বিক্রি হলে ঐ জমির সাথে যুক্ত

Scanned by CamScanner

ভূমিদাসরাও হস্তান্তরিত হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, সামন্ত ব্যবস্থায় রাজা সামন্তদের উপর অর্থ ও সৈন্যবলের জন্য একান্তভাবে নির্ভরশীল থাকেন। স্বভাবতই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার শক্তি বৃদ্ধি ঘটলে অনিবার্যভাবেই রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। অর্থাৎ সামন্ত ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় শক্তির অবনমন ঘটে এবং আঞ্চলিক শক্তির উত্থান অনিবার্য হয়।

ঐতিহাসিক *কোশাম্বী* (D. D. koshambi) তাঁর *'অ্যান ইনট্রোডাকশন টু দি স্টাডি অফ্ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি'* গ্রন্থে বলেছেন যে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের গোড়ার দিকে ভারতে একটি কৃষি প্রধান গ্রামীণ অর্থনীতি বহাল ছিল। এই ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষ কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করত। এর বাইরে প্রাথমিকভাবে তথাকথিত ভূস্বামী বা অধিস্বামী ছিল না। কিন্তু মাঝে মাঝে এই কর্মীগোষ্ঠী রাজ নির্দেশের বাইরে গিয়ে কৃষকদের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করে প্রচলিত ব্যবস্থার সরল কাঠামোটি বিপর্যস্ত করত। কোশাম্বী এই ব্যবস্থাকে *'উপর থেকে সামন্ততন্ত্র'* নাম দিয়েছেন। চতুর্থ ও পঞ্চম শতক (গুপ্তদের আমল) এবং সপ্তম শতকে (হর্ষবর্ধনের আমল) এই কর্তৃত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। সপ্তম শতকের শেষদিকে গ্রামীণ সমাজের অভ্যন্তরেই একটি ভূস্বামী শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে। এই ভূস্বামীরা কৃষকের কাছ থেকে জোর করে উদ্বৃত্ত আদায় করত। এটিকে তিনি *"নিচু থেকে সামন্ততন্ত্র"* বলে চিহ্নিত করেছেন। *ইরফান হাবিবের* মতে, মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এইরূপ 'উপর থেকে সামন্ততন্ত্র' ও 'নিচু থেকে সামন্ততন্ত্র' শব্দ প্রয়োগ গ্রহণযোগ্য নয়। অধ্যাপক *শর্মা*ও ভারতীয় সামন্ততন্ত্র সম্পর্কে এই 'দ্বি-স্তর' ভূমি-সম্পর্ক ব্যবস্থার অস্তিত্ব মানতে অস্বীকার করেছেন। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের একটি বিবৃতি (পঞ্চাশ শতক) উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, ক্ষেত্রস্বামী (ভূস্বামী) কৃষকের উপরেই দায়িত্বভার ন্যস্ত করে। দ্বিতীয় শতকের গোড়ায় শক-রাজপুত্র উসবদত্তের একটি দানপত্র থেকেও জমির উৎপন্নের উপর অ-কৃষকের ব্যক্তিগত অধিকারের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। *ইউ. এন. ঘোষাল* তাঁর *'কনট্রিবিউশানস্ টু দি হিস্ট্রি অফ্ দি হিন্দু রেভেনিউ সিস্টেম'* গ্রন্থে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাং-এর মন্তব্যের ভিত্তিতে প্রমাণ করেছেন যে সপ্তম শতকে ভারতে 'রাজস্ব-প্রদানকারী ব্যক্তিগত ভূমি-কর্ষকের' অস্তিত্ব ছিল।

কার্লমার্কস কথিত এশীয় উৎপাদন পদ্ধতির সাথে ভারতে সামন্ততন্ত্রের উপাদানের বিকাশের সম্পর্ক বিষয়ে ঐতিহাসিকদের দ্বিমত আছে। এশীয় রীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে তিনি জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অভাব, জমির উপর উপজাতীয় গোষ্ঠী-মালিকানা, স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামের অস্তিত্ব ও বদ্ধ অর্থনীতির বিকাশ, নগরের অভাব ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। মার্কসীয় বোধের ভিত্তিতে এই উৎপাদন ব্যবস্থার দুটি উপাদান সক্রিয়—গ্রামীণ গোষ্ঠী এবং প্রাচ্য ঈশ্বরতন্ত্র। ইরফান হাবিবের মতে প্রথম উপাদানটি বেশি প্রামাণিক। এতে শ্রম-রীতির কাঠামোর সংজ্ঞা আছে। তাহল, একটি নির্দিষ্ট পেশার সাহায্যে ব্যক্তিগত দাসত্ব ছাড়াই একটি স্বাবলম্বী খুচরো উৎপাদন এবং রাষ্ট্রের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত আদায়ের ব্যবস্থা। এই স্বাভাবিক-অর্থনীতি গ্রামের বাইরে পণ্য-সঞ্চালনের মাধ্যমে উদ্বৃত্তের সদ্ব্যবহারের পথ সুগম করেছিল, এমনটা অসম্ভব নয়। অর্থাৎ প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতীয় সমাজ হল উদ্বৃত্তের ভোগদখলকারী একটি শাসকশ্রেণি ও গ্রাম্য গোষ্ঠীর বাইরে বিনিময়ের ভিত্তিতে শ্রম-বিভাজন বিশিষ্ট একটি শ্রেণী-সমাজ। এই উৎপাদন পদ্ধতি সামাজিক-অচলতা ও রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচার সৃষ্টির সহায়ক। অধ্যাপক *কোসাম্বী*,

Scanned by CamScanner

শর্মা প্রমুখ প্রাচীন ভারতীয় সমাজের এই স্থানুত্বের অস্তিত্ব মানতে অস্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে, এশীয় উৎপাদন পদ্ধতির ধারণা ভারতীয় সমাজের সাথে খাপ খায় না। প্রাচীন ভারতে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল এবং রাজাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শাসকশ্রেণী জনসাধারণের উৎপাদনের উদ্বৃত্ত আদায় করত। আদি-মধ্যকালীন ভারতে নগরের অস্তিত্ব খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। *ইরফান হাবিব* দেখিয়েছেন যে, স্বয়ং মার্কস কোভালস্কি রচিত (১৮৭৯ খ্রীঃ) গোষ্ঠীগত জমি অধিকার সম্পর্কিত প্রতিবেদনে ভারতীয় গ্রাম্য গোষ্ঠীর অভ্যন্তরেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্থানকে চিহ্নিত করেছেন। এর ফলে গোষ্ঠীর অভ্যন্তরেই দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়েছিল। ড. *হাবিব* লিখেছেন, অতএব, ভারতীয় গোষ্ঠী তার গভীর অন্তর্দেশ অবধি সম্পূর্ণ রূপে (একটি) অচলায়তন—এ ধারণা দীর্ঘকাল আঁকড়ে ধরে রাখা আর সম্ভব নয়।[1]

খ্রীষ্টীয় ৬৫০ - ১২০০ অব্দে ভারতে সামন্ত ব্যবস্থার বিকাশ এবং পশ্চিম ইউরোপীয় সামন্ত-তন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে অনেক ক্ষেত্রেই উভয়ের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের (৫৫০ বা ৫৭০ খ্রীঃ) পর তদর্থে ভারতে কোন কেন্দ্রীয় শক্তি ছিল না। পরবর্তী প্রায় ৬০০ বছর ভারতের রাজনীতিতে আঞ্চলিক শক্তির অবস্থান ছিল অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই কালপর্বে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে গুর্জর প্রতিহার, পূর্ব ভারতে পাল ও সেন বংশ, দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূটগণ এবং সুদূর দক্ষিণে চোল রাজ্য শক্তিশালী আঞ্চলিক শাসনের প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই সকল রাজ্য ক্ষমতা ও সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য দীর্ঘ সংগ্রামে লিপ্ত থাকলেও, পরিণামে কোন কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভারতে সামন্ততন্ত্রের বিকাশ সহজ হয়। বলা যায়, শক্তিশালী কেন্দ্রের অভাব সামন্ততান্ত্রিক উপাদানগুলিকে সমৃদ্ধ করে এবং সামন্ততান্ত্রিক উপাদানগুলির দৃঢ়ভিত্তি আঞ্চলিকতাবাদকে পুষ্ট করে। তবে পশ্চিম ইউরোপের 'ভূমিদাস' ব্যবস্থার প্রতিরূপ ভারতে দেখা যায় না। ভারতের সামন্ত ব্যবস্থার সর্ব-নিম্নস্তরে ছিল ভূমিহীন কৃষক। তবে তারা কেউই জমির সাথে আবদ্ধ ছিল না, জমি বিক্রয় বা হস্তান্তরের সাথে সাথে কৃষকদের হস্তান্তরিত করা হত না। অবশ্য ইউরোপের ভূমিদাসদের থেকে এদের আর্থিক অবস্থা খুব বেশি উন্নত ছিল না। শোষণ-নিপীড়নের মাত্রাও ছিল যথেষ্ট।

ড. রামশরণ শর্মা, বি. এন. এস. যাদব, ডি, এন. ঝা প্রমুখ মনে করেন যে, তাম্রশাসন জারী করে নিষ্কর ভূসম্পদ দানব্যবস্থা সপ্তম শতকে ভারতে সামন্ত ব্যবস্থার বীজ বপন করে। পরবর্তীকালে ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ভূমিস্বত্ব ও রাজস্ব হস্তান্তরের ঘটনা বৃদ্ধি পেলে সামন্ত ব্যবস্থার ভিত সবল হয়। ড. *শর্মা* সামন্ত প্রথার উদ্ভব ও বিকাশের ঘটনাকে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। তাঁর মতে ৩০০-৬০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কালে সামন্ত ব্যবস্থার উন্মেষ ঘটে। ৬০০-৯০০ খ্রীষ্টাব্দে সামন্ত ব্যবস্থা ব্যাপকতা পায়। এবং ৯০০-১২০০ অব্দে একদিকে এর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব জারী হয়, আবার অবক্ষয়েরও সূচনা হয়। ড. *শর্মা* পুরাণ গ্রন্থে 'কলিযুগ'-সংক্রান্ত বিবরণীটিকে তাঁর মতের সমর্থনে গ্রহণ করেছেন। পুরাণ কথিত চারটি যুগের (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ) মধ্যে কলিযুগ'কে অস্থির, অনিশ্চিত, বিশৃঙ্খলা ও দুর্যোগের কাল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। খ্রীষ্টীয়

Scanned by CamScanner

চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে রচিত পুরাণ গ্রন্থে কলিযুগকে যেভাবে আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের, অস্থিরতার কাল বলা হয়েছে, তাতে সামন্ত ব্যবস্থার আগমনবার্তা শোনা যায় বলে শর্মা মনে করেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অগ্রহার ব্যবস্থা প্রবর্তনের সূত্রে প্রাপ্ত ভূখণ্ড বা গ্রামের উপর দান গ্রহীতার এক ধরনের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। বস্তুত, তারা ভূস্বামীতে পরিণত হন। প্রাপ্ত ভূখণ্ডের রাজস্ব আদায় ও ভোগের সঙ্গে সঙ্গে লিখিত বা অলিখিত ভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রশাসনিক দায়িত্বও দানগ্রহীতা গ্রহণ করেন। ড. *শর্মা* কলিযুগের বর্ণনার ভিত্তিতে মনে করেন যে, শাসকদের পক্ষে রাজস্ব আদায় তখন সম্ভব হত না বলেই, সম্ভবত ভূস্বামীদের হাতে স্থানীয় প্রশাসনিক দায়িত্ব ভাগ করে দেবার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে এই ব্যবস্থা যে রাজার সার্বভৌম কর্তৃত্বের পরিপন্থী ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। গুপ্ত ও বকাটক রাজাদের আমলে 'অগ্রহার' দান ব্যবস্থার সৃষ্টি হলেও, ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালে ভূমিদানের রীতি বহুল বৃদ্ধি পায়। পালদের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় বৌদ্ধবিহার, শৈবমন্দির, নালন্দা মহাবিহার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত ভাবে ব্রাহ্মণ পুরোহিত, বৌদ্ধভিক্ষু প্রমুখ বহু জমি অগ্রহার দান হিসেবে ভোগদখল করতেন। সেনবংশ , প্রতিহার বংশীয় রাজাদের আমলেও এই রীতি বহাল ছিল। দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট রাজাদের তাম্রশাসন থেকেও 'ব্রহ্মদেয়' দান, 'দেবদান' ইত্যাদির কথা জানা যায়। ড. *রণবীর চক্রবর্তী* লিখেছেন যে, একাদশ-দ্বাদশ শতকে দক্ষিণ ভারতের বিশাল মন্দিরগুলি এতটাই ভূসম্পদশালী হয়ে ওঠে যে সেগুলি রাজ্যের অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপকেও নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে।

অধ্যাপক শর্মা আসরাফপুর তাম্রশাসনের (৬৭৫ খ্রীঃ) ভিত্তিতে দেখিয়েছেন যে ভূমিদাস-সংক্রান্ত আদেশনামায় মালিকানা ছাড়াও ভোগাধিকারী (ভূজ্যমানক) ও কৃষক (কৃষ্যমানক)- এর উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মালিকানার বাইরে জমি ভোগাধিকারের ধারণা ছিল, যা মালিকানা থেকে স্বতন্ত্র। আবার মালিক ও ভোগাধিকারীর বাইরে কৃষকের অস্তিত্বও ছিল। রাজস্থান, মালবদেশ প্রভৃতি স্থানে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে দান গ্রহীতাকে বলা হয়েছে যে, তিনি নিজে চাষ করতে পারেন, কিংবা কাউকে দিয়ে চাষ করিয়ে নিতে পারেন (কৃষতঃ কর্ষাপয়তঃ) ; নিজে ভোগ করতে পারেন বা কাউকে দিয়ে ভোগ করাতে পারেন (ভুঞ্জতো ভোজাপয়তঃ)। অধ্যাপক *রণবীর চক্রবর্তীর* মতে, এই ব্যবস্থা কৃষি অর্থনীতিতে স্তরীকরণের গতি বৃদ্ধি করে। এই রূপ স্তরবিন্যাস সামন্ততন্ত্রের চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পাল প্রতিহারদের তাম্রশাসনগুলিতে ভূমিদান করলেও ভূখণ্ডের চতুর্সীমা যথাযথভাবে নির্দিষ্ট করা হত না। এই সুযোগে দানগ্রহীতা জমির চৌহদ্দি বৃদ্ধি করতে পারতেন। এই অতিরিক্ত রাজস্ব ভূস্বামীর আর্থিক শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক হত। দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রেও ব্যক্তি মালিকানার প্রসার ঘটেছিল। নোবুরু কারাশিমা ভারতে সামন্ত ব্যবস্থার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে চোল যুগে (নবম-দশম শতক) অ-ব্রহ্মদের গ্রামগুলি 'উর' নামক গ্রামসভার সমষ্টিগত অধিকারে ছিল। হস্তান্তর-সংক্রান্ত লেখগুলিতে দানকর্তা হিসেবে 'উর'-এর নামোল্লেখ আছে। কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন যে ব্রহ্মদের গ্রামগুলিতে ব্রাহ্মণ ভূস্বামীদের অস্তিত্ব ছিল। চোল সম্রাট তৃতীয় রাজরাজের আমলে ব্যক্তিগত ভাবে ভূমিদানের

Scanned by CamScanner

প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্ন-কাবেরী উপত্যকার এই সকল জমি ক্রয়-বিক্রয়ের দলিলে 'উর'-এর নাম নেই। অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক জমি হস্তান্তরের ঘটনা থেকে দক্ষিণ ভারতেও ব্যক্তিগত মালিকানার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়।

অষ্টম শতক ও পরবর্তীকালে ভূমিদান ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাবল্য প্রসঙ্গে ড. শর্মা ধর্মনিরপেক্ষ ভূমিদান বিষয়টির উপর জোর দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ ও ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিকে 'অগ্রহার' দান ব্যবস্থার মাধ্যমে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার সূচনা হয়; কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান এবং প্রশাসক ও সেনাকর্মচারীদের রাজস্ব ভোগদখলের অধিকার দেওয়া হলে সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃত্ব জোরালো রূপ পায়। অধ্যাপক শর্মার মতে, অষ্টম-দশম শতকে বাণিজ্যের সংকোচ ঘটলে মুদ্রা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সরকারী সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের নগদ বেতনের পরিবর্তে ভূমি-রাজস্ব ভোগের অধিকার দেওয়া হয়। এই সকল এলাকার উদ্বৃত্ত রাজস্ব সম্ভবত রাজকোষে জমা দেওয়া হত। এবং রাজার প্রাপ্য রাজস্ব যথাযথ জমা দিতে পারলে এরা নিজ নিজ এলাকায় ইচ্ছামত কর সংগ্রহ করতে পারতেন। *ড. রণবীর চক্রবর্তীর* মতে, *"সামন্তদের মধ্যে এক একটি এলাকা বরাদ্দ করে দেবার মধ্যে মধ্যযুগের জায়গীর ব্যবস্থার কিছু সাদৃশ্য আছে"*[1]। গুর্জর প্রতিহারদের রাজ্যে 'বংশ পোতক ভোগ' অধিকার অর্থাৎ বংশানুক্রমিক ভাবে জমি ভোগদখলের অধিকার স্বীকৃত ছিল। এর মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় একটি বিশেষ বংশের ধারাবাহিক কর্তৃত্ব বজায় থাকত। এই প্রবণতা সামন্ততান্ত্রিক উপাদানকে শক্তিশালী করেছিল। *ড. শর্মা* পালরাজা রামপালের আমলে *'কৈবর্ত্ত'* বিদ্রোহের ঘটনাকে সামন্ততন্ত্রের প্রেক্ষাপট বর্ণনার কাজে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে 'কৈবর্ত্ত' বিদ্রোহ ছিল মূলত একটি কৃষক বিদ্রোহ। সম্ভবত সামন্তদের শোষণ ও দমনমূলক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছিল এই অভ্যুত্থান। দেখা যায় পাল রাজা সামন্তদের সহায়তা নিয়ে এই বিদ্রোহ দমনে তৎপর হয়ে ছিলেন। এ থেকে দুটি সিদ্ধান্ত করা যায় (১) রাজা তাঁর অস্তিত্বের জন্য সামন্তদের উপর বিশেষ নির্ভরশীল ছিলেন এবং (২) কৈবর্ত-কৃষক বিদ্রোহের বিরুদ্ধে সামন্তদের প্রতিরোধ এই ভুস্বামী শ্রেণীর শোষণমূলক চরিত্রের প্রমাণ দেয়।

সপ্তম থেকে দশম শতকে ভারতে বাণিজ্যের অধোগতি ও নগরায়ণের অবক্ষয়ের ঘটনাকে ড. শর্মা সামন্ত ব্যবস্থার উদ্ভবের অন্যতম প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর মতে, এই সময়ে কৃষির উপর এতটাই প্রাধান্য ও নির্ভরতা বেড়েছিল, যার পূর্বদৃষ্টান্ত নেই। এর মূলে ছিল বাণিজ্যের ক্রমিক অবনতি। এই মতের সমর্থনে তিনি পুরাণের বিবরণ ও মুদ্রা অর্থনীতির ভাঙনের উল্লেখ করেছেন। *'বিষ্ণু পুরাণ'* ও *'স্কন্দ পুরাণ'* গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, কলিযুগে বৈশ্যদের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অবনতি ঘটবে এবং তারা বাণিজ্য ত্যাগ করে কারিগরের হীন বৃত্তি গ্রহণ করবে। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের পরবর্তীকালে ভারত-রোম বাণিজ্যের অবসান ঘটলে ভারতের অর্থনীতির উপরেও তার প্রভাব পড়ে। জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা বৃদ্ধির সূত্রে স্বয়ম্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি গড়ে ওঠে। উদ্বৃত্ত উৎপাদনে অনীহা তীব্রতর হয়। স্বভাবতই বাণিজ্যের গতি মন্থর হয়। আলোচ্যকালে মুদ্রা-অর্থনীতিও রক্তাল্পতার শিকার হয়। বকাটকদের আমলেই

Scanned by CamScanner

মুদ্রার ব্যবহার সংকুচিত হয়। পাল ও সেন রাজারা কোন মুদ্রা প্রচলন করেননি। রাষ্ট্রকূটদেরও কোনও মুদ্রা ছিল না। গুর্জর-প্রতিহারদের কিছু মুদ্রার সন্ধান পাওয়া যায়। তবে সেগুলির আন্তর্জাতিক বিনিময় মূল্য ছিল না। তাই বাণিজ্যের কাজে সম্ভবত ব্যবহার করা হত না। ড. *শর্মার* মতে, কার্যত ৬০০-১০০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তীকালে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির বিলোপ চূড়ান্ত হয়েছিল। একই সময়ে নগর-অবক্ষয়ের ঘটনাও সামন্ততন্ত্রের উত্থানতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে। অধ্যাপক *বি. এন. এস. যাদব* জিন প্রভসুরী 'র 'বিবিধার্থকল্প'-এর একটি উদ্ধৃতির ভিত্তিতে মন্তব্য করেছেন যে, আদি-মধ্যযুগে নগরগুলি ভেঙে প্রায় গ্রামে রূপান্তরিত হয়েছিল। ড. শর্মা হিউয়েন সাং-এর বিবরণের ভিত্তিতে মনে করেন যে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের পরবর্তীকালে গাঙ্গেয় উপত্যকার কিছু সমৃদ্ধ নগর যেমন—শ্রাবস্তী, বৈশালী, কৌশাম্বী, কপিলাবস্তু, কুশীনগর ইত্যাদি অবক্ষয়ের কবলে পড়েছিল। হিউয়েন সাঙ কয়েকটি নগরকে প্রায় প্রাণহীন, রিক্ত ও গ্রামীণ চরিত্রবিশিষ্ট বলে উল্লেখ করেছেন। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে গড়ে ওঠা নগরগুলির পুরাতাত্ত্বিক অবশেষ বিশ্লেষণ করে ড. শর্মা সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, আদি-মধ্যযুগে শহরগুলি ক্রমে হতদরিদ্র রূপ নেয় এবং ধীরে ধীরে জনশূন্য হয়ে পড়ে। নগরের এই অবক্ষয়কে শর্মা সামন্ত ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

আদি-মধ্যযুগে ভারতে সামন্ত ব্যবস্থার সূচনা ও বিকাশ সম্পর্কে ড. শর্মা, যাদব প্রমুখের সিদ্ধান্ত সকলে মেনে নেননি। ভারতে আদি-মধ্যযুগের অর্থনৈতিক ছক সম্পর্কে শর্মা প্রমুখের মতের বিরোধিতা করেছেন *ড. দীনেশ চন্দ্র সরকার, হরবন্স মুখিয়া* প্রমুখ। অধ্যাপক *সরকারের* মতে, আদি-মধ্যযুগের তাম্রশাসনগুলিতে এমন কোন কথা উল্লেখ নেই, যা থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে ভূমিদানের ফলে রাজকোষের আয় হ্রাস পেয়েছিল। তাঁর মতে, দানগ্রহীতা জমির রাজস্ব ভোগ করতেন, কিন্তু কর সংগ্রহের অধিকার বা ক্ষমতা ছিল একমাত্র রাজার। তাছাড়া 'করশাসন' নামক সরকারী আদেশনামার ভিত্তিতে তিনি দেখিয়েছেন যে; এই সকল আদেশনামা দ্বারা রাজা 'অগ্রহার' এলাকা থেকেও প্রয়োজনে কর সংগ্রহ করতে পারতেন। তাঁর মতে, সামন্ত ব্যবস্থার ফলে রাজা বা ভূস্বামীদের তেমন ভাবে আর্থিক ক্ষতি ঘটেনি। এই ব্যবস্থায় প্রকৃত ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সাধারণ কৃষকশ্রেণী। *ড. রণবীর চক্রবর্তী* মনে করেন, অধ্যাপক সরকারের মতামত খুব স্পষ্ট নয়। কারণ তিনি সামন্ত রাজাদের *'ফিউডেটরী চিফ'* (Feudatory chiefs) এবং অভিজাতদের প্রাপ্ত ভূখণ্ড (ইনাম)-কে *'ফিফ'* (Fief) বলে নানা সময় উল্লেখ করেছেন।

অধ্যাপক *হরবন্স মুখিয়া* পশ্চিম ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে ড. শর্মা কথিত ভারতীয় সামন্ত ব্যবস্থার ধারার তুলনা করে ভারতে সামন্ত ব্যবস্থার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, সামন্ততন্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দুটি বৈশিষ্ট্য হল—(১) উৎপাদনের উপকরণের উপর সামন্তপ্রভুর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ এবং (২) চুক্তি (Contract)। আদি-মধ্যযুগের ভারতে এদুটি উপাদানের অস্তিত্ব ছিল না। ভারতে উৎপাদনের উপকরণগুলি কৃষকদের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং ভূমি দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে কোনরূপ চুক্তি স্বাক্ষরিত হত না। এমনকি, কৃষক কোনভাবেই জমির সাথে আবদ্ধ ছিল না। অধ্যাপক শর্মা ভারতে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বাণিজ্যের অধোগতি ও নগরের ক্রমিক অবক্ষয়ের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু

Scanned by CamScanner

ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় তাঁর *'Markets and Merchants in Early Medieval Rajastan'* প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতকে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য যথেষ্ট উন্নত ছিল। তিনি লেখমালার ভিত্তিতে বহু ব্যস্ত বাণিজ্যকেন্দ্রের নাম উল্লেখ করেছেন। *কীর্তিনারায়ণ চৌধুরী* ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠার ফলে ভারত মহাসাগরে বাণিজ্যের নতুন ধারার উপর গবেষণা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন অষ্টম শতকের আগে পশ্চিম এশিয়ার জাহাজগুলি চীনের ক্যান্টন বন্দর পর্যন্ত চলাচল করত। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে ভারতের পশ্চিম উপকূলে পৌঁছানো সহজ হয়। অষ্টম শতকে চীনা জাহাজগুলি দক্ষিণ ভারতের কালিকট ও কুইলন বন্দরে আসত। এখানেই আসত আরব জাহাজ গুলিও। এখান থেকে চীনাপণ্য আরব জাহাজে তোলা হয়। এইভাবে ভারতীয় বন্দরগুলি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়। অর্থাৎ বাণিজ্য হ্রাস, নগরের অবক্ষয় ইত্যাদি তত্ত্ব দ্বারা সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব সম্পর্কে ড. শর্মার যুক্তি সর্বজনগ্রাহ্য নয়।

সপ্তম শতকের পরবর্তীকালে ভারতে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে বিতর্ক চলছে। সামন্ততন্ত্রের কালগত কাঠামো এবং আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি ছাড়া এই বিতর্কের সমাধান সম্ভব নয়। তবে সপ্তম শতকে ভারতে ভূমিদান ব্যবস্থা ব্যাপকতা পাওয়ার ফলে জমির উপর যেভাবে ব্যক্তিগত মালিকানার সৃষ্টি হয়, তাতে সামন্ততান্ত্রিক উপাদানগুলির পোষণ ঘটা সহজ হয়। আক্ষরিক অর্থে আদি-মধ্যযুগের ভারতে সামন্ত ব্যবস্থা হয়তো গড়ে ওঠেনি ; তবে সেকালে ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তনের পথ ধরে সামন্ততান্ত্রিক উপাদানগুলির যে আবির্ভাব ঘটেছিল, তা বলা সম্ভবত অযৌক্তিক হবে না।

Scanned by CamScanner